ইউনিট ৫ চিংড়ি চাষ

চিংড়ি চাষ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা পৃথিবীতে চিংড়ির চাহিদা বাড়ার ফলে বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পা্েছ। গত এক দশকে বাংলাদেশে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হ্েছ। বাংলাদেশে চিংড়ির চাষ যোগ্য অনেকগুলো প্রজাতি থাকলেও বর্তমানে প্রধানত গলদা ও বাগদা চিংড়ির চাষ হ্েছ। গলদা মিঠা পানির এবং বাগদা লোনা পানির চিংড়ি। চিংড়ির চাষের স্থান নির্বাচন অত্যন্ গুর€ত্বপ র্ণ। স্থান নির্বাচনের পর পুকুর খনন, পানি সরবরাহ, পোনা ছাড়ার হার, খাদ্য ও সার প্রয়োগ খুব গুর€ত্বপ র্ণ। চিংড়ির পোনা ছাড়ার যেমন সময় আছে তেমনি চিংড়ি বড় হওয়ার পর আহরণেরও সময় আছে। সঠিক পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করে বাজারজাত করতে পারলে চাষীরা লাভবান হবেন।

এ ইউনিটে চিংড়ি সম্েদর গুর€ত্ব ও চাষের পটভূমি, স্বাদু ও লোনাপানির চিংড়ির প্রজাতি এবং বাংলাদেশে চাষযোগ্য প্রজাতি, বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি চাষ পদ্ধতি, চিংড়ি চাষের স্থান নির্বাচন, বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা, চিংড়ির আহরণ, আহরণ কালে লক্ষ্যণীয় বিষয়, গলদা ও বাগদা চিংড়ির রেণু শনাক্তকরণ সম্র্কে বিস্ারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব ও চাষের পটভ মি, স্বাদু ও লোনাপানির চিংড়ির প্রজাতি এবং বাংলাদেশে চাষযোগ্য প্রজাতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

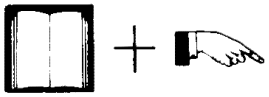

- চিংড়ি সম্েদর গুর€ত্ব ও চাষের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাদু ও লোনা পানির চিংড়ির প্রজাতির নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে চাষযোগ্য চিংড়ির প্রজাতির নাম উলে- খ করতে পারবেন।

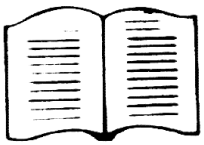

চিংড়ি সম্েদর গুর€ত্ব ও চাষের পটভূমি

বাংলাদেশ চিংড়ি সম্েদ খুবই সমৃদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশের মহীসোপান অঞ্চলের আয়তন ২৭,০০০ বর্গমাইল। বাংলাদেশের ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহীসোপান অঞ্চলের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২০-৫০ লক্ষ হেক্টর। মহীসোপান অঞ্চলের প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর ভূমিতে ম্যানগ্রোভ বর্ণভূমি বিদ্যমান। চেষ্টা করলে এসব ভূমি হতে ২.০-২.৫ লক্ষ হেক্টর ভূমি চিংড়ি চাষের আওতায় আনা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে

চিংড়ির চাষ হ্েছ। এর মাঝে খুলনা অঞ্চলে প্রায় ১,১০,০০০ হেক্টর ও কক্সবাজার অঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর।

বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হ্েছ। এর মাঝে খুলনা অঞ্চলে প্রায় ১,১০,০০০ হেক্টর ও কক্সবাজার অঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর। ১৯৮৪-৮৫ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৬৪,০০০ হেক্টর। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ১,১০,৭৯০ মেট্রিক টন। এ উৎপাদনের ৪,১৮৮ মেট্রিক টন এসেছে ট্রলার কর্তৃক। ক্ষুদ্র জেলেরা আহরণ করেছে ১৯,৫৪৫ মেট্রিক টন। উপকূলীয় খামার হতে এসেছে ২৬,৩৩৫ মেট্রিক টন। অন্যান্য উপায়ে আহরিত হয়েছে ৬০,৭২২ মেট্রিক টন। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে ৭৮৭.৭৩ কোটি টাকা। রপ্তানিকৃত চিংড়ির পরিমাণ ছিল ২২,০৫৪ মেট্রিক টন। শুধুমাত্র চিংড়ির পোনা ধরার কাজেই জড়িত রয়েছে ২-৫ লক্ষ লোক। চিংড়ি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে প্রায় ১.৫-২ লক্ষ লোক জড়িত আছে।

চিংড়ি সম্েদর গুর€ত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার চিংড়ি উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য ২০০০ সাল পর্যন্ আধা নিবিড় চাষের সরকারি পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ করেছে। এসময়ে চিংড়ির উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ৪,৩২,০০০ মেট্রিক টন এবং এ উৎপাদন হতে সম্ভাব্য আয় দাঁড়াবে ৮,০০০ কোটি টাকা।

বর্তমানে চিংড়ি রপ্তানি করে যে আয় হয় (৭৮৭.৭৩ কোটি টাকা) তার পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭.৮%। বাংলাদেশে চিংড়ির চাষযোগ্য যে পরিমাণ জমি আছে তা থেকে অতি সহজেই চিংড়ির উৎপাদন ব্যাপক হারে বাড়ানো সম্ভব। এর ফলে জাতীয় আয়ে চিংড়ির অবদান আরও বাড়ানো সম্ভব। যতই দিন যা্েছ চিংড়ি চাষীরা ও বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য চাষের প্রতি গুর€ত্ব প্রদান করছে।

স্বাদু ও লোনা পানির চিংড়ি প্রজাতি

বাংলাদেশের স্বাদু ও লোনা পানিতে প্রায় ৬০টি চিংড়ির প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। এসব প্রজতির অধিকাংশই *Macrobrachium, Palaemon, Penaeus, Metapenaeus, Parapenaeopsis* I *Acetes* গণের অন্ ভুর্ক্ত।

Macrobrachium গণের প্রজাতিগুলো মিঠা পানি ও ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে বাস করে।

Palaemon গণের সবগুলো প্রজাতি মিঠা পানিতে বাস করে (১টি প্রজাতি ছাড়া)

Penaeus গণের সবগুলো লোনা পানিতে বা সমুদ্রে বাস করে।

Metapenaeus গণের সবগুলো প্রজাতি লোনা পানি বা সমুদ্রে বাস করে।

Parapenaeopsis গণের সবগুলো প্রজাতি সমুদ্রে পাওয়া যায়।

Acetes গণের প্রজাতি সমুদ্র ও ঈষৎ লোনা পানিতে বাস করে।

Solenocera, Trachypenaeus, Hippsolysmata, Heterocarpus, Plesionika, Metapenaeopsis, Leptocarpus, গণের প্রজাতিসম হ লোনা পানি বা সমুদ্রে বাস করে।

বাংলাদেশে চাষ যোগ্য চিংড়ি প্রজাতি

বাংলাদেশে নিম্নলিখিত চিংড়ির প্রজাতিগুলোর চাষ সম্ভব।

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	আবাসস্থল
বাগদা চিংড়ি	*Penaeus monodon*	লোনা পানি
চাপদা চিংড়ি	*Penaeus indicus*	লোনা পানি
ডোরাকাটা চিংড়ি	*Penaeus Japonicus*	লোনা পানি
বাগতারা চিংড়ি	*Penaeus semiculcutus*	লোনা পানি
কোলা চিংড়ি	*Penaeus merguensis*	লোনা পানি
হরিনা চিংড়ি	*Metapaeneus monceros*	লোনা পানি
কচু চিংড়ি	*Metapaeneus lysianassa*	লোনা পানি
হন্নি চিংড়ি	*Metapaeneus brevicornis*	লোনা পানি
বাগতারা / র€ডা চিংড়ি	*Parapenaeopsis stylifer*	লোনা পানি
র€ডা চিংড়ি	*Parapenaeopsis sculptilis*	লোনা পানি
খইড়া চিংড়ি	*Parapenaeopsis uncta*	লোনা পানি
গলদা চিংড়ি	*Macrobrachium rosenbergii*	স্বাদু পানি
ছটকা চিংড়ি	*Macrobrachium malcolmsonii*	স্বাদু পানি

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাপক হারে বাগদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে। এটি লোনা পানির প্রজাতি এবং উপকূল এলাকায় এর চাষ হচ্ছে। বাগদা চিংড়ির পোনার সাথে চাপদা ও ডোরাকাটা চিংড়ির পোনা ঘেরে বা পুকুরে ঢুকে থাকে। এগুলো বাগদা চিংড়ির সাথেই বড় হয় এবং বাজারজাত করা হয়। সচেতন চাষীরা পোনা বাছাই করে বাগদা চিংড়ির একক চাষ করে থাকেন। চাপদা বা ডোরাকাটা চিংড়ির একক চাষ এখনও বাংলাদেশে হচ্ছে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাপক হারে বাগদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে। এটি লোনা পানির প্রজাতি এবং উপকূল এলাকায় এর চাষ হচ্ছে।

মিঠাপানির চিংড়ির সাথে বর্তমানে কেবল গলদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে এবং ছটকা চিংড়ির চাষ ও অতি সহজে করা সম্ভব।

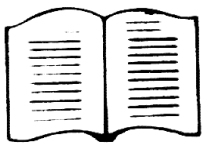

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশের মহীসোপান অঞ্চলের পরিমাণ ২৭০০০ বর্গমাইল। মহীসোপান অঞ্চলের প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ বনভূমি বিদ্যমান। বর্তমানে বাংলাদেশে ১,৪০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ির চাষ হচ্ছে। বর্তমানে চিংড়ির সর্বমোট উৎপাদন ১,১০,৭৯০ মেঃ টন। ১৯৯৩-৯৪ সালে চিংড়ি রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৭৯৭.৭৩ কোটি টাকা। ২০০০ সালে চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪,৩২,০০০ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে স্বাদু ও লোনা পানিতে চিংড়ির প্রায় ৬০ টি প্রজাতি পাওয়া যায়।

বর্তমানে *Penaeus monodon* Ges *Macrobrachium rosenbergii* এর চাষ হচ্ছে। প্রথমটি লোনা পানির এবং দ্বিতীয়টি স্বাদু বা মিঠা পানির।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বাংলাদেশের মহীসোপান অঞ্চলের পরিমাণ কত?
ক) ১০০০০ বর্গমাইল
খ) ১৮,০০০ বর্গমাইল
গ) ২৫,০০০ বর্গমাইল
ঘ) ২৭,০০০ বর্গমাইল

২। বাংলাদেশে বর্তমানে কি পরিমাণ জমিতে চিংড়ির চাষ হচ্ছে?
ক) ৯০,০০০ হেক্টর
খ) ১,১০,০০০ হেক্টর
গ) ১,৩০,০০০ হেক্টর
ঘ) ১,৪০,০০০ হেক্টর

৩। ২০০০ সালে বাংলাদেশের চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?
ক) ৩,৮৮,০০০ মেট্রিক টন
খ) ৪,২০,০০০ মেট্রিক টন
গ) ৪,৩২,০০০ মেট্রিক টন
ঘ) ৪,৪২,০০০ মেট্রিক টন

৪। বাংলাদেশে স্বাদু ও লোনা পানির কতটি প্রজাতি আছে?
ক) ৪০ টি
খ) ৫০ টি
গ) ৬০ টি
ঘ) ৬৫ টি

৫। বর্তমানে কোন প্রজাতির চিংড়ি চাষ হচ্ছে?
ক) *Acetes sp*
L) *Palaemon sp*
M) *Metapaeneus sp*
N) *Penaeus sp.*

পাঠ ৫.২ বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঘেরে চিংড়ির চাষ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধান ক্ষেতে চিংড়ির চাষ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- লবণ উৎপাদনের ক্ষেতে চিংড়ির চাষ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে বর্তমানে নিম্নলিখিত উপায়ে বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে ঃ

- ঘেরে চিংড়ির চাষ
- ধান ক্ষেতে চিংড়ির চাষ
- লবণ উৎপাদনের ক্ষেতে চিংড়ির চাষ
- পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ

ঘেরে চিংড়ির চাষ

উঁচু বাঁধ দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির চারিদিকে ঘের দেয়া হয়। ঘেরে পানি রাখা হয় ০.৬-০.৯ মিটার। ঘেরের আকার ৩-১৯৫ হেক্টর পর্যন্ত হতে পারে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড যেসব বোল্ডার নির্মাণ করেছে সেসব বোল্ডারের বাইরে ও ভিতরে ঘের তৈরি করে চিংড়ির চাষ হচ্ছে। অনেক বড় এলাকা জুড়ে উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘের তৈরি করা হয়। অর্থাৎ উঁচু বাঁধ দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির চারিদিকে ঘের দেয়া হয়। ঘেরে পানি রাখা হয় ০.৬-০৯ মিটার। ঘেরের আকার ৩-১৯৫ হেক্টর পর্যন্ত হতে পারে। ঘেরে জোয়ারের পানি যাওয়া আসার জন্য পুইস গেট থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারী বা পৌষ মাসে ঘেরে লোনা পানি ঢুকানো হয়। কারণ এ সময় চিংড়ির পোনার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। এ সময় পানির লবণাক্ততা থাকে ৭-৮%। প্রায় ১ মাস সময় ধরে ঘেরগুলোতে পোনা ঢুকানো হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সবচেয়ে বেশি পোনা ঢুকে। এ অবস্থায় পোনার সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তদুপরি চিংড়ির পোনার সাথে মাছের পোনাও ঢুকে। তবে বর্তমানে অনেকে পোনা কিনে প্রতি হেক্টরে ২২৫০০-২৫০০০টি পোনা ছেড়ে থাকেন এবং ঘেরে সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন। সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করলে উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০০-৫০০ কেজি/হেঃ। বাগদা চিংড়ির চাষের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে চিংড়ি ধরা হয়। মাছগুলো ধরা হয় সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী পর্যন্ত। ঘেরে গলদা চিংড়ির চাষের বেলায় আগস্ট মাসে পোনা ছাড়া হয়। এ সময় বৃষ্টির পানিতে ঘেরগুলো ভরে যায় এবং পানির লবণাক্ততা কমে যায়। এ সময় ধান রোপণ করা হয়। আমন ধানের সাথে প্রতি হেক্টরে ৭৫০০টি গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়া হয়। চিংড়িগুলোকে নভেম্বর এবং ফেব্রুয়ারীর ভিতর ধরা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে গলদা চিংড়ির উৎপাদন দাঁড়ায় ৫০-৭৫ কেজি।

ঘেরে গলদা চিংড়ির চাষের বেলায় আগস্ট মাসে পোনা ছাড়া হয়।

ধান ক্ষেতে চিংড়ির চাষ

ধান ক্ষেতে যখন গলদা চিংড়ির চাষ করা হয় তখন ধান ক্ষেতের আইল বেঁধে ০.৫-১.০ মিটার গভীর পানি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর প্রতি হেক্টরে ১০,০০০ – ১৫,০০০টি পোনা ছাড়া হয়। পোনা ছাড়ার সময় আগষ্ট মাস। চিংড়িকে এ সময় অনেকে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে চিংড়ি ধরা হয়। প্রতি হেক্টরে চিংড়ির উৎপাদন ২৫০-৩৫০ কেজি হতে পারে।

লবণ উৎপাদনের ক্ষেতে চিংড়ির চাষ

লবণের ক্ষেতে চিংড়ির চাষ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকতেই ম লত হয়ে থাকে। বর্ষাকালে লবণ উৎপাদন হয় না। তাই উক্ত সময়ে জোয়ারের পানির সাথে চিংড়ি ও নানা জাতের মাছের পোনা ঢুকে। এসব পোনা লবণ ক্ষেতে ২-৩ মাস আট্‌কিয়ে রেখে ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন দাঁড়ায় ১৮০-২৭৫ কেজি/হেক্টর। এ ধরণের চাষে বাগদাসহ অন্যান্য লোনা পানির চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে।

পানির সর্বোত্তম লবণক্তা থাকতে হয় ১৫-২৫ পিপিটি।

পুকুরে চিংড়ির চাষ

গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পুকুরের পানির লবণাক্ততা প্রয়োজন ০.৪ পিপিটি।

বাগদা চিংড়ির চাষের জন্য লোনা পানির প্রয়োজন হয় এবং পানির সর্বোত্তম লবণক্তা থাকতে হয় ১৫-২৫ পিপিটি (Parts per thousand)। পানির গভীরতা থাকতে হয় ১-১.৫ মিটার। পুকুরের আকার ১ একর হতে ২৫-৩০ একর পর্য— হতে পারে। ৩০-৫০ মিঃ মিঃ আকারের ১৫,০০০-৩০,০০০ টি/হেঃ হারে (হালকা নিবিড়) বা ৩০,০০০-৫০,০০০ টি/হেঃ হারে (আধা নিবিড় চাষের জন্য) পোনা ছাড়তে হয়। এতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন দাঁড়াবে ১০০০-১৩০০০ কেজি। বাংলাদেশে পুকুরে চিংড়ি চাষে সর্বো‍চ্চ ৫-৬ টন/হেক্টর সম্ভব হয়েছে। তবে পৃথিবীর কোন কোন দেশে এ উৎপাদন ৩০-৫০ টন/হেক্টর/বছর পর্য— সম্ভব হয়েছে। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পুকুরের পানির লবণাক্ততা প্রয়োজন ০.৪ পিপিটি এবং পানির গভীরতার প্রয়োজন ১.০-১.৫ মিটার। পুকুরের আকার কয়েক শতাংশ হতে কয়েক একর পর্য— হতে পারে। পুকুরে পোনা ছাড়ার হার ১০,০০০-৫০,০০০ টি/হেঃ। সম্পূরক খাদ্য বা সুষম কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করলে উৎপাদন দাঁড়াবে ৮০০-১৫০০ কেজি।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার এলাকায় যে পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে তা বর্ণনা করুন এবং ঐ এলাকায় চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল হবে সে সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট মতামত বর্ণনা করুন (অনুর্ধ্ব ১৫০ শব্দ)।*

উপরে যেসব চাষের কথা বলা হলো সেগুলোকে ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে বিন্যাস করলে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

- সনাতন পদ্ধতিতে চাষ
- আধা নিবিড় চাষ
- নিবিড় চাষ

সনাতন পদ্ধতিতে চাষ

ঘের, লবণের ক্ষেত, ধান ক্ষেত ও পুকুরে সনাতন পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে অনুমান ভিত্তিক হারে পোনা ছাড়া হয় এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের উপরই চিংড়ির উৎপাদন নির্ভর করে। এ ধরনের চাষে অন্য প্রজাতির প্রাণীর জাতও জন্মে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন ১৩৫-১৮৫ কেজি/হেঃ হয়।

আধা নিবিড় চাষ

অন্য দিকে আধা নিবিড় চাষে হিসেব করে পোনা ছাড়া হয় এবং চিংড়ির জন্য সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া জলাশয়ের পানি বদলের ব্যবস্থাও থাকে। পুকুরে চিংড়ির মজুত হার ৩০,০০০-৫০,০০০টি/হেঃ হতে পারে। এ পদ্ধতিতে উৎপাদন ১-৪ মেঃ টন/হেঃ পর্য— হতে পারে।

নিবিড় চাষ

নিবিড় চাষের বেলায় পুকুর ছোট থাকে। পুকুরে হ্যাচারি উৎপাদিত একক প্রজাতির পোনা ছাড়া হয়। পুকুরে মজুত হার ২,৮০,০০০টি/হেঃ পর্যন্ হতে পারে। পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ করবার জন্য বাতাসের পাম্প ব্যবহৃত হয়। চিংড়িকে উন্নত মানের কৃত্রিম খাদ্য দেয়া হয়। নিয়মিত পানি বদল করা হয় এবং পুকুর থেকে চিংড়ির মল ও অন্যান্য জৈবিক আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদনের হার ১০ মেঃ টন/হেঃ/বছর বা তার চেয়ে অনেক বেশিও হতে পারে। বাংলাদেশে প্রধানত সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে।

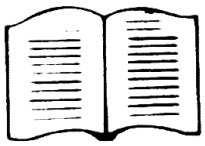

সারমর্ম ঃ ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে ঘেরে লোনা পানি ঢুকিয়ে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। এসব চিংড়ি ধরা হয় জুলাই মাসে। গলদা চিংড়ি চাষ করার জন্য আগস্ট মাসে ঘেরে পোনা ছাড়া হয়। এ সময় বৃষ্টির পানিতে ঘের ভরে যায় এবং লবণাক্ততা অনেক কমে যায়। ঘেরের গলদা চিংড়ি নভেম্বর - ফেব্রুয়ারীতে ধরা হয়। ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ করার জন্য প্রতি হেক্টরে ১০,০০০-১৫,০০০ টি/পোনা ছাড়া হয়। লবণ উৎপাদনের ক্ষেতে বর্ষাকালে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। বর্ষাকালে লবণ উৎপাদনের ক্ষেতে জোয়ারের পানির সাথে চিংড়ি ও মাছের পোনা ঢুকে। পুকুরে বাগদা চিংড়ির চাষের জন্য পানির গভীরতা রাখতে হয় ১-১.৫ মিটার। লবণাক্ততা রাখতে হয় ২৫-৩০ পিপিটি। হালকা নিবিড় চাষে উৎপাদন হয় ১০০০-১৩০০ কেজি/হেঃ। অন্য দিকে আধা নিবিড় চাষে উৎপাদন হয় ৫-৬ টন। গলদা চিংড়ির পুকুরের গভীরতাও ১.০-১.৫ মিটার রাখতে হয়। পানির লবণাক্ততার প্রয়োজন ০.৪ পিপিটি। এতে উৎপাদন হয় ৮০০-১৫০০ কেজি/হেঃ। সনাতন পদ্ধতির চাষের বেলায় পোনা ছাড়া হয় অনুমান ভিত্তিক এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর উৎপাদন নির্ভরশীল। অন্যদিকে আধা নিবিড় চাষে হিসেব করে পোনা ছাড়া হয় এবং সম্পূরক খাদ্য ও সার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ঘেরে কখন লোনা পানি ঢুকাতে হয়?
- ক) জুলাই - আগষ্ট
- খ) অক্টোবর - নভেম্বর
- গ) ডিসেম্বর - জানুয়ারী
- ঘ) ফেব্রুয়ারী - মার্চ

২। বাগদা চিংড়ির পুকুরের পানির গভীরতা কত হওয়া উচিত?
- ক) ০.৫ - ১.০ মিটার
- খ) ১.০ - ১.৫ মিটার
- গ) ১.৫ - ২.০ মিটার
- ঘ) ২.০ - ২.০ মিটার

৩। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পুকুরের পানির লবণাক্ততা কত হওয়া প্রয়োজন?
- ক) ০.১ পিপিটি
- খ) ০.২ পিপিটি
- গ) ০.৪ পিপিটি
- ঘ) ০.৬ পিপিটি

৪। পুকুরে গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়ার হার কত?
- ক) ৫,০০০ - ১০,০০০টি/হেঃ
- খ) ৫,০০০ - ৩০,০০০টি/হেঃ
- গ) ১০,০০০ - ৫০,০০০টি/হেঃ
- ঘ) ২০,০০০ - ৭০,০০০টি/হেঃ

৫। বাংলাদেশে চিংড়ির প্রধানত কোন ধরনের চাষ হয়ে থাকে?
- ক) সনাতন পদ্ধতিতে
- খ) হালকা নিবিড় পদ্ধতিতে
- গ) আধা নিবিড় পদ্ধতিতে
- ঘ) নিবিড় পদ্ধতিতে

পাঠ ৫.৩ চিংড়ি চাষের স্থান নির্বাচন, বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

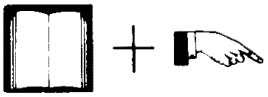

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চিংড়ি চাষের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।
- বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্Ÿর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চিংড়ি চাষের স্থান নির্বাচন

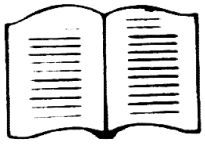

বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লোনা পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রয়োজন এবং সমুদ্র থেকেই তা পাওয়া সম্ভব।

বাগদা চিংড়ি

উপকূলীয় এলাকার যেখানে জোয়ার ভাটার প্রভাব থাকে সেখানেই বাগদা চিংড়ির চাষের স্থান নির্বাচন করা সম্ভব। বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লোনা পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রয়োজন এবং সমুদ্র থেকেই তা পাওয়া সম্ভব। পুকুর বা খামারের জন্য এঁটেল বা দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে ভাল। যেসব অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিমাণ কম থাকে সেসব অঞ্চলে পুকুর তৈরির খরচ কম হয়। পুকুর তৈরির স্থান সমতল হলে পুকুর তৈরির খরচ কম হয়। সেজন্য ভূমির বন্ধুরতা দেখা প্রয়োজন। জলোŽছাসের বা সমুদ্র ঝড়ের আওতায় পুকুর পড়ে কি না তাও দেখে নিতে হবে। যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গলদা চিংড়ি

যেখানে পুকুর বা খামার নির্মাণ করবে সে স্থানের মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা থাকতে হবে। এর জন্য এঁটেল ও দোআঁশ মাটি সর্বোত্তম। প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করার বন্দোবস্ থাকতে হবে। বন্যা মুক্ত এলাকা হতে হবে। ছায়ামুক্ত স্থান হতে হবে। যোগাযোগের সুবিধা থাকতে হবে।

বাগদা চিংড়ির চাষ ও ব্যবস্থাপনা

বাগদা চিংড়ির পুকুরের গভীরতা করতে হবে ১.০-১.০ মিটার।

স্থান নির্বাচনের কাজ সম্Ÿন্ন হলে পুকুর খনন শুর€ করতে হবে। বাগদা চিংড়ির পুকুরের গভীরতা করতে হবে ১.০-১.০ মিটার। পুকুরের আকৃতি আয়তাকার হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। পুকুরের আয়তন এক বা একাধিক হেক্টর হতে পারে। প্রতিটি পুকুরে পানি ঢুকার ও বের হওয়ার জন্য পুইস গেট থাকতে হবে। পুকুরের বাঁধ যথেষ্ট উঁচু হতে হবে যাতে সহজে জোয়ারের পানি বা বৃষ্টির পানিতে প-াবিত না হতে পারে।

পুকুরের তলায় যাতে কোন গাছের গুড়ি না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের তলায় কৌণিক ভাবে একটি নালা তৈরি করতে হবে। নালাটি পুকুরের পানি বের হওয়ার পুইস গেটের সাথে সংযুক্ত থাকবে। পুকুর তৈরির সময় পানিতে বাতাস দেয়ার এবং পানি ছিটানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পুকুর খননের কাজ সম্Ÿন্ন হওয়ার পর পোনা ছাড়ার জন্য পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। প্রথমেই পুকুরে সারণি-১ অনুসারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ১। মাটির পিএইচ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের পরিমাণ।

মাটির পিএইচ	প্রতি শতাংশে চুনের পরিমাণ (কেজি)
৪.০	১১.০
৫.০	৭.০
৬.০	৩.৫
৭.০	প্রয়োজন নেই

চুন পুকুরে পানি দেয়ার আগে বা পরে ব্যবহার করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগ সম্পন্ন হলে সারণি-২ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ২। বিভিন্ন সারের প্রয়োগ মাত্রা।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেঃ)
মুরগির বিষ্ঠা অথবা গোবর	২৫০ - ২৭০
ইউরিয়া	৫০.০
টি.এস.পি	৫০.০

সার দেয়া সম্পন্ন হলে পুকুরের পানির গভীরতা ১.০ - ১.৫ মিটারে উন্নীত করতে হবে। দুই থেকে তিন সপ্তাহের ভিতর পুকুরের পানির রং সবুজ হয়ে উঠবে। তখন হালকা নিবিড় চাষ পদ্ধতির জন্য প্রতি হেক্টরে ১৫,০০০ - ৩০,০০০ টি পোনা, আধা নিবিড় চাষের জন্য ৩০,০০০ - ৫০,০০০ টি পোনা এবং নিবিড় চাষের জন্য ২,৮০,০০০ টি পোনা ছাড়তে হবে। পোনার আশ্রয়ের জন্য ফাঁক ফাঁক করে প্রতি হেক্টরে ৪-৬ টি নারিকেলের ডগা পুকুরের তলায় ফেলতে হবে।

বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য পানির ব্যবস্থাপনা খুবই গুর€ত্বপ র্ণ। হালকা নিবিড় চাষের বেলায় প্রতি অমাবস্যা ও প র্ণিমার জোয়ারের সময় পুকুরের পানির ৪০-৫০% জোয়ারের পানি দ্বারা বদল করে দিতে হবে। আধা নিবিড় চাষের বেলায় প্রতিদিন পুকুরের পানির ৩০-৪০% লোনা পানি দ্বারা বদল করে দিতে হবে।

তাছাড়া আধা নিবিড় চাষের বেলায় প্রতি দিন ১৮ - ২০ ঘন্টা সময় পুকুরের পানিতে বাতাস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাতাস দেয়ার যন্ত্র দ্বারা এ কাজটি করা সম্ভব। পুকুরে পানিও ছিটাতে হবে।

হালকা ও আধা নিবিড় চাষের বেলায় নিয়মিত সার ব্যবহার করে পানির স্বচ্ছতা (সেকি ডিস্ক) ২৫ - ৪০ সেঃ মিঃ রাখতে হবে।

প্রতিদিন চিংড়িকে ৩-৬ বার সম্পূরক খাদ্য দিতে হবে। খাদ্য সরবরাহ করার জন্য ট্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। কখনও যেন খাদ্য অধিক পরিমাণে না দেয়া হয়। খাদ্য বেশি হলে পানি নষ্ট হয়ে যায় এবং এতে পানি দ ষিত হয়ে চিংড়ি মারা যায়। চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য সারণি-৩ অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে।

সারণি ৩। চিংড়ির সম্ভাব্য রক খাদ্য তৈরির উপাদান ও পরিমাণ।

উপকরণের নাম	পরিমাণ (%)
গমের ভূষি	১৫
চালের মিহিকুঁড়া	২৫
ফিশমিল	৪০
আটা	১৫
খৈল (সয়াবিন বা সরিষা)	৫
মোট	১০০

এভাবে ব্যবস্থাপনা করলে জুলাই মাসের ভিতর প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন দাঁড়ায় ৫০-৬০ গ্রাম।

সাধারণত অমাবস্যা বা পূর্ণিমার 'জু' এর সময় পুকুর বা খামার হতে চিংড়ি ধরা হয়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি চিংড়ি ধরা শেষ হয়।

***অনুশীলন (Activity) ঃ** ধরুন, আপনার প্রতিবেশী জনাব শাহজালাল সাহেবের একটি বড় আকারের চিংড়ি খামার আছে এবং আপনি ঐ খামারের একজন মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। ঐ খামারের জন্য উপরোক্ত উপকরণগুলো দিয়ে ৫০০ কেজি চিংড়ির খাবার তৈরি করার জন্য কোনটি কী পরিমাণে ব্যবহার করবেন তার একটি সারণি তৈরি করুন।*

গলদা চিংড়ির চাষ ও ব্যবস্থাপনা

গলদা চিংড়ির পুকুরের আকার ০.৫-৫.০ হেক্টর হতে পারে। পুকুরের গভীরতা থাকতে হবে ১.০-১.৫ মিটার। পানির লবণাক্ততার প্রয়োজন ০.৪ পিপিটি (Parts per thousand)। পুকুরের পাড় এমন উঁচু হতে হবে যাতে বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে প্লাবিত না হয়।

পুরাতন পুকুরে চাষ করতে হলে প্রথমে বিদ্যমান উদ্ভিদ, মাছ ও পোকা-মাকড় সরাতে হবে। পুকুর শুকিয়ে বা ঔষধ বা কীটনাশক ব্যবহার করে এ কাজটি করা যেতে পারে। এরপর মাটির পিএইচ দেখে চুন প্রয়োগ করতে হবে এবং সারণি-৪ অনুসারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ৪। মাটির পিএইচ অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা।

মাটির পিএইচ	চুনের পরিমাণ (কেজি/শতাংশ)
৪.০	৮ - ১৫
৫.০	৪.৫ - ৩.৫
৬.০	২.০ - ২.৫
৭.০	১

চুন পানি দেয়ার আগে বা পরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগের পর সারণি-৫ অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

সারণি ৫। চুন প্রয়োগের পর বিভিন্ন সারের প্রয়োগ মাত্রা।

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
মুরগির বিষ্ঠা বা গোবর	৩০০
ইউরিয়া	২৫
টি.এস.পি	১২
পটাশ	৫

সার ব্যবহারের পর পানির গভীরতা ১.০ - ১.৫ মিটার করতে হবে। সার ব্যবহারের ২-৩ সপ্তাহের মাঝে পুকুরের পানি সবুজ বর্ণের হবে। এ সময় পানির স্বŸছতা (সেকি ডিস্ক) দাঁড়াবে ২৫-৩৫ সে. মি.। এ অবস্থায় একক চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০,০০০ - ৫০,০০০ টি গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়বে। পোনার আশ্রয়ের জন্য নারিকেলের ডগা ব্যবহার করা যেতে পারে। মিশ্র চাষের জন্য অন্যান্য মাছের পোনার সাথে প্রতি হেক্টরে ৮,০০০ - ১০,০০০ টি পোনা ছাড়া যেতে পারে। ঝিনুকের মাংস, শামুকের মাংস, ছোট মাছ, মাছের ডিম, কেঁচো, মরা চিংড়ি ইত্যাদি চিংড়ির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া বাগদা চিংড়ির জন্য যে সম্ভূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয় (আগেই বলা হয়েছে) তাও গলদা চিংড়ির জন্য ব্যবহার করা চলে। নভেম্বর - ফেব্র€য়ারীর ভিতর চিংড়ি ধরা হয়। এ সময় গড়ে প্রতিটি চিংড়ির ওজন দাঁড়ায় ৪০ - ৬০ গ্রাম।

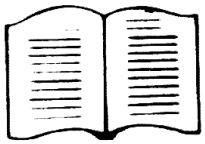

সারমর্ম ঃ উপকূলীয় এলাকায় জোয়ারীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ির পুকুর বা খামার নির্মাণ করতে হয়।

এঁটেল ও দো-আঁশ মাটি পুকুরের জন্য উত্তম। জলোŸছাস বা সমুদ্র ঝড়ে যাতে পুকুরের ক্ষতি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পুকুরে পানি ঢুকা ও বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পোনা ছাড়ার আগে মুরগির বিষ্ঠা/গোবর, ইউরিয়া, টি.এস.পি. সার ব্যবহার করতে হবে। এঁটেল ও দো-আঁশ মাটির পুকুর গলদা চিংড়ির জন্য উপযোগী। চাষের জন্য পানি সরবরাহ অত্যাবশ্যক। পানির লবণাক্ততা রাখতে হবে ০.৪ পিপিটি। পুরাতন পুকুরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আগাছা ও প্রাণী দ র করতে হবে। ঝিনুকের ও শামুকের মাংস, ছোট মাছ, কেঁচো, মাছের ডিম, চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

নভেম্বর - ফেব্র€য়ারী মাসের ভিতর চিংড়ি ধরতে হয়।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বাগদা ও গলদা চিংড়ির পুকুরের জন্য কোন কোন মাটি ভাল?
- ক) বেলে, বালি
- খ) এঁটেল, দোঁ-আশ
- গ) অনুর্বর, বেলে
- ঘ) ল্ম ও কাদা

২। বাগদা চিংড়ির পুকুরের গভীরতা কত রাখতে হবে?
- ক) ০.৫ - ০.৭৫ মিটার
- খ) ১.০ - ১.৫ মিটার
- গ) ২.০ - ২.৫ মিটার
- ঘ) ২.৫ - ৩.০ মিটার

৩। বাগদা চিংড়ির পুকুরের পানির লবণাক্ততা কত রাখা উত্তম?
- ক) ১০ - ১৫ পিপিটি
- খ) ১৫ - ২০ পিপিটি
- গ) ২০ - ২৫ পিপিটি
- ঘ) ২৫ - ৩০ পিপিটি

৪। গলদা চিংড়ির পুকুরের মাটির পিএইচ ৬ হলে কী হারে চুন ব্যবহার করতে হয়?
- ক) ১.৫ - ২.০ কেজি/শতাংশ
- খ) ২.০ - ২.৫ কেজি/শতাংশ
- গ) ২.৫ - ৩.০ কেজি/শতাংশ
- ঘ) ৩.০ - ৩.৫ কেজি/শতাংশ

৫। গলদা চিংড়ির একক চাষের জন্য কী হারে পোনা ছাড়তে হয়?
- ক) ১০,০০০ - ২০,০০০/হেঃ
- খ) ১০,০০০ - ৩০,০০০/হেঃ
- গ) ১০,০০০ - ৪০,০০০/হেঃ
- ঘ) ১০,০০০ - ৫০,০০০/হেঃ

পাঠ ৫.৪ আহরণ সময়, আংশিক আহরণ, সম্পূর্ণ আহরণ এবং আহরণকালে লক্ষণীয় বিষয়

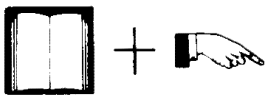

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চিংড়ি আহরণের সময় সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চিংড়ি আহরণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- চিংড়ি আহরণের সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা উল্লেখ করতে পারবেন।

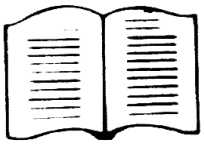

চিংড়ির আহরণ সময়

গলদা চিংড়ি নভেম্বর এবং ফেব্রুয়ারী মাসের ভিতর ধরা হয়। অন্যদিকে বাগদা চিংড়ি ধরা শুরু হয় এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এবং ধরা শেষ হয় জুলাই মাসের মাঝামাঝি। অর্থাৎ চিংড়ির ওজন যখন গড়ে ৩০ গ্রাম বা তার উপরে পৌঁছে তখন চিংড়ি ধরা হয়।

চিংড়ির আহরণ পদ্ধতি

আংশিক আহরণ

চিংড়ি যখন ৩০ গ্রাম বা তার চেয়ে বেশি ওজনের হয় তখন চিংড়ি ধরা শুরু হয়। চিংড়ি ধরার সময় দুটি নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে। যথা আংশিক আহরণ এবং সম্পূর্ণ আহরণ।

> বড় চিংড়ি ধরে তাদের স্থলে আবার ছোট চিংড়ি পুকুরে ছাড়া হয়। এ ধরণের আহরণ পদ্ধতিকে বিরামহীন বা Continuous পদ্ধতি বলা।

আংশিক আহরণের সময় বড় বড় চিংড়িগুলোকে প্রথম ধরা হয় এবং ছোটগুলোকে পরে ধরা হয়। তাছাড়া বড় চিংড়ি ধরে তাদের স্থলে আবার ছোট চিংড়ি পুকুরে ছাড়া হয়। এ ধরণের আহরণ পদ্ধতিকে বিরামহীন বা Continuous পদ্ধতি বলা হয়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে পুকুর, ধান ক্ষেত, বা ঘের থেকে প্রথমে চিংড়ি ধরা হয় তারপর ধৃত চিংড়ি হতে বড় চিংড়িগুলোকে রেখে ছোটগুলোকে জলাশয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ির একটি অংশ (বড়) অল্প সময়ের ভিতর বিক্রি শুরু করা যায়। এতে ছোট চিংড়িগুলো বড় হওয়ার জন্য বেশি খাদ্য, স্থান ও সময় পায়। তাছাড়া ইচ্ছা করলে একটি নির্দিষ্ট আকারে প্রায় সবগুলো চিংড়িকে বড় করা যায়। তবে আংশিক আহরণে কিছু কিছু চিংড়ি আঘাত পাওয়ার ফলে বা খোলস বদলের কারণে মারা যেতে পারে বা রোগাক্রান্ত হতে পারে। এতে উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ির টাকা এক সাথে চাষীর হাতে আসেনা। বরং দীর্ঘ সময় ধরে চাষীর হাতে আসে। এরফলে চাষীর মূলধন তৈরি হওয়ার সুযোগ কমে যায়।

সম্পূর্ণ আহরণ

সম্পূর্ণ আহরণের বেলায় যখন চিংড়ি ধরার সময় হয় তখন ছোট বড় সব চিংড়িকে এক সাথে ধরা হয়। জলাশয়ে কোন চিংড়িই রাখা হয় না। এ ধরণের আহরণে চিংড়ির আকার নানা ধরণের থাকে। ফলে সবগুলো চিংড়ির গ্রেড এক হয় না। এ পদ্ধতিতে চিংড়িগুলোকে দীর্ঘদিন জলাশয়ে রাখতে হয়। এরফলে অনেক চিংড়ি মারা পড়ে এবং ছোট চিংড়িগুলো খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতায় বা বড়দের

‘অবস্থানগত চাপে’ সহজে বড় হতে পারে না। তাছাড়া চিংড়ির যে অংশটি আকারে ছোট থাকে তাদের বাজার দরও কম থাকে। সম্পূর্ণ আহরণে খোলস বদল নরম চিংড়িগুলোকেও ধরে ফেলতে হয়। এগুলোরও বাজার দর কম।

সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে সবগুলো চিংড়ি এক সাথে ধরে এক সাথে বিক্রি করা হয় বলে চাষীর মূলধন সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে। তাছাড়া এক সাথে জলাশয় খালি হয় বলে পরবর্তী চাষের জন্য জলাশয়কে সময়মত তৈরি করা যায়। সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে পুকুর বা জলাশয়গুলোকে শুকানো যায় এবং সেই সাথে পুকুরের পঁচা কাদা সরানোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ করা যায়। পুকুর শুকালে চিংড়ির উৎপাদন অনেক বাড়ে এবং পুকুর দীর্ঘদিন ভাল অবস্থায় থাকে।

চিংড়ি আহরণ প্রক্রিয়া

ফাঁদ বা দোসনা, ঝাকি জাল ও পানি শুকিয়ে জলাশয় হতে চিংড়ি ধরা বা আহরণ করা যেতে পারে। চিংড়ি যখন বড় হয় তখন জলাশয় থেকে বের হয়ে চলে যেতে চেষ্টা করে। এসময় চিংড়ি স্রোতের বিপরীত দিকে চলে। চিংড়ির এ স্বভাবকে কাজে লাগানোর জন্য জোয়ারের পানি পুকুরে ঢুকানো হয়। এ সময় পুইসে ফাঁদ লাগানো থাকে। চিংড়ি প্রবেশকৃত জোয়ারের পানির বিপরীত দিকে চলে ফাঁদে প্রবেশ করে। ফাঁদ থেকে পরে চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়।

ঝাকি জাল দিয়ে দুভাবে চিংড়ি আহরণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পুকুরে সরাসরি জাল মেরে চিংড়ি আহরণ। দ্বিতীয়তঃ জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে পুইসের ফাঁদে তৈরি পুকুরে প্রথমে চিংড়ি জমানো তারপর পুকুরের পানি কমিয়ে পুকুরের জমা চিংড়ি সহজেই ঝাঁকি জাল দিয়ে আহরণ যায়। পুকুরের, ঘেরের বা ধান ক্ষেতের পানি শুকিয়ে অতি সহজে চিংড়ি ধরা যায়। এ পদ্ধতিতে ১০০% চিংড়ি আহরণ সম্ভব হয়, যদি জলাশয় খুব বেশি বড় হয় এবং জলাশয়ের তলা নিচু থাকে তাহলে পানি নিষ্কাশন করতে অনেক খরচ পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে পানি নিস্কাশন ব্যয় অসম্ভব হয়।

আহরণকালে লক্ষণীয় বিষয়

চিংড়ি আহরণের সময় চিংড়ির আকারের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ বড় আকারের চিংড়ির দাম ছোট আকারের চিংড়ির তুলনায় অনেক বেশি। সদ্য খোলস বদলকৃত নরম চিংড়ির দাম অনেক কম থাকে। সেজন্য এ অবস্থায় চিংড়ি ধরতে নেই। আংশিক আহরণের সময় ছোট চিংড়িগুলো ও খোলস বদলকৃত চিংড়িগুলো যাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বা অন্য কোন ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাজার দর দেখে চিংড়ি ধরতে হবে এবং বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের দিকগুলো নিশ্চিত হয়ে চিংড়ি আহরণ করতে হবে।

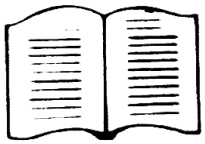

সারমর্ম ঃ গলদা চিংড়ি নভেম্বর মাস হতে ফেব্রুয়ারী মাসের ভিতর আহরণ করা হয়। বাগদা চিংড়ি আহরণ করা শুরু হয় এপ্রিলের শেষের দিকে এবং শেষ হয় জুলাই মাসের মাঝামাঝি। চিংড়ির গড় ওজন যখন ৩০ গ্রামে পৌঁছে তখনই চিংড়ি আহরণ শুরু হয়। আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে চিংড়ি আহরণ করা হয়। আংশিক আহরণের বেলায় বড় চিংড়িগুলোকে শুধু আহরণ করা হয়। এ ধরণের আহরণকে বিরামহীন আহরণ বলা হয়। সম্পূর্ন আহরণের বেলায় সবগুলো চিংড়িকে এক সাথে ধরা হয়। বিরামহীন আহরণের বেলায় চাষীর মূলধন তৈরির সুযোগ কম থাকে। সম্পূর্ণ আহরণের বেলায়

চাষীর ম লধন তৈরির সুযোগ বেশি থাকে। ফাঁদ, ঝাঁকিজাল ও পানি শুকিয়ে জলাশয় হতে চিংড়ি ধরা যেতে পারে। জলাশয় শুকিয়ে চিংড়ি ধরতে পারলে একদিকে যেমন ১০০% চিংড়ি ধরা সম্ভব হয় অন্য দিকে পুকুর শুকিয়েও সংস্কার করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। চিংড়ির আকার, বাজার দাম, বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে চিংড়ি আহরণ করতে হবে। ছোট ও খোলস বদলকৃত চিংড়িগুলোকে আহরণকালে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। গলদা চিংড়ি আহরণের সময় কখন?
- ক) জুলাই - আগস্ট
- খ) আগষ্ট - সেপ্টেম্বর
- গ) সেপ্টেম্বর - জানুয়ারী
- ঘ) নভেম্বর - ফেব্রুয়ারী

২। বাগদা চিংড়ি কোন মাসে ধরা শুর€ হয় এবং কোন মাসে শেষ হয়?
- ক) ডিসেম্বর - জানুয়ারী
- খ) জুনুয়ারী - মার্চ
- গ) এপ্রিল - জুলাই
- ঘ) মে - আগস্ট

৩। চিংড়ি আহরণের পদ্ধতি কয়টি?
- ক) ১
- খ) ২
- গ) ৩
- ঘ) ৪

৪। কোন পদ্ধতিতে সব চিংড়ি এক সাথে ধরা হয়?
- ক) সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে
- খ) আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে
- গ) সব ধরণের পদ্ধতিতে
- ঘ) বিরামহীন পদ্ধতিতে

৫। আংশিক আহরণের বেলায় কোন আকারের চিংড়িগুলো ধরা হয়?
- ক) ছোট আকারের
- খ) বড় আকারের
- গ) সব আকারের
- ঘ) পোনা আকারের

পাঠ ৫.৫ গলদা ও বাগদা চিংড়ি শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গলদা চিংড়ি বৈশিষ্ট্য উলে- খপ র্বক শনাক্ত করতে পারবেন।
- বাগদা চিংড়ি বৈশিষ্ট্য উলে- খপ র্বক শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ

জাল, বালতি, ফরমালিন, মেগনিফাইং গ- াস, ট্রে, সাহায্যকারী বই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)

সর্ববৃহৎ - পুর€ষ চিংড়ি - ৩২০ মিলিমিটার

স্ত্রী চিংড়ি - ২৫০ মিলিমিটার

রং - হালকা নীল অথবা হালকা সবুজ।

উদর খোলস - উদর ও খোলস যেখানে মিশেছে সেখানে (সংযোগস্থলে) নীলবন্ধনী থাকে।

পা - ২য় চলন পদ বড় ও চিমটাযুক্ত থাকে।

করাত - করাতের উপরিভাগে ১১-১৪টি দাঁত থাকে। নিচের অংশে থাকে ৮-১৪টি। করাতের মাথা ধনুকের মত বেঁকে উপরে উঠে যায়।

দাগ - পিছনের দিকে গোলকের মিলিত স্থানে নিচের দিকে ৩-৪ টি হলুদ দাগ থাকে।

করাতের মাথা বেঁকে যাওয়া এবং পিছনের হলুদ দাগ শনাক্তকরণের সবচেয়ে সহজ উপায়।

বিশেষ লক্ষণীয়

করাতের মাথা বেঁকে যাওয়া এবং পিছনের হলুদ দাগ শনাক্তকরণের সবচেয়ে সহজ উপায়। (চিত্র-৪৮)

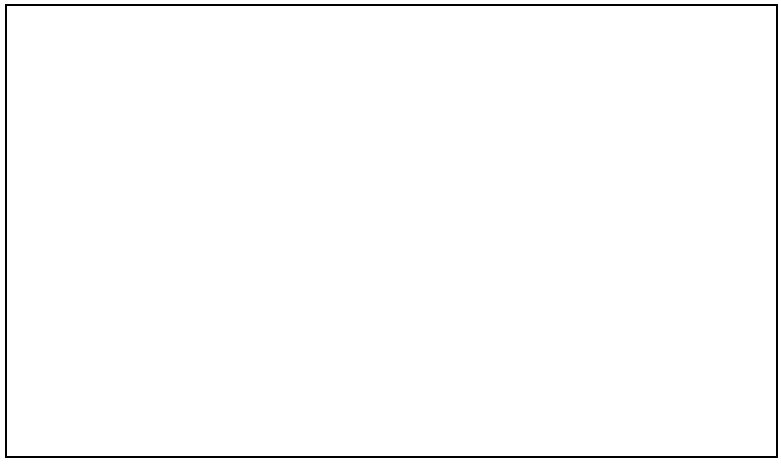

চিত্র ৪৮ ঃ গলদা চিংড়ি

বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*)

সর্ব বৃহৎ - পুর€ষ ২৯৮ মিলিমিটার

স্ত্রী ৩৩৬ মিলিমিটার

বাঘের গায়ের ডোরার মত কালচে রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে।

রং - হালকা সবুজ

ডোরা - বাঘের গায়ের ডোরার মত কালচে রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে।

পা - ইউরোপডে নীল বর্ণের দুটি ডোরাকাটা দাগ থাকে।

উদর - উদর অঞ্চলের নিচ দিকে ও পায়ে হলোদে ও লাল মিশানো ডোরা দাগ থাকে।

টেলসন (লেজ) - পাশের কাঁটা নেই।

বিশেষ লক্ষণীয়

বাঘের মত ডোরাকাটা দাগ থাকে। এজন্য এর নাম Giant tiger shrimp (চিত্র-৪৯)।

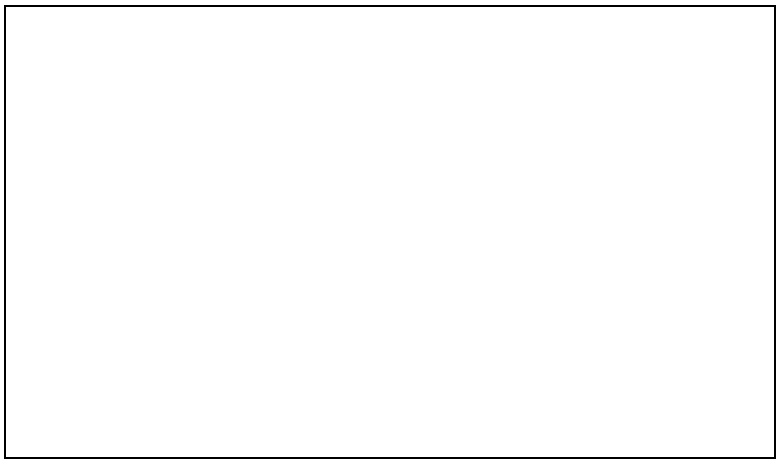

চিত্র ৪৯ ঃ বাগদা চিংড়ি

কার্যপ্রণালী

জালদ্বারা চিংড়ি ধরে ঢাকনা ওয়ালা বালতিতে ৫% ফরমালিন দ্বারা সংরক্ষণ করতে হবে। গবেষণাগার কাছে হলে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।

গবেষণাগারে চিংড়িগুলোকে অন্যান্য মাছ বা কীটপতঙ্গ হতে আলদা করতে হবে। এরপর কিছুটা আন্দাজের উপর প্রজাতি ভিত্তিক চিংড়িগুলোকে আলাদা করতে হবে। এরপর বইয়ের বর্ণনার সাথে

মিলিয়ে গলদা ও বাগদা চিংড়িগুলোকে শনাক্ত কর€ন এবং ব্যবহারিক খাতায় কার্যপ্রণালী সহ ছবি এঁকে টিউটরকে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিন।

পাঠ ৫.৬ গলদা ও বাগদা চিংড়ির রেণু শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গলদা চিংড়ির রেণু শনাক্ত করতে পারবেন।
- বাগদা চিংড়ির রেণু শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ

জাল, থলি, মেগনিফাইং গ-াস, ফরমালিন, ওয়াচ গ-াস, পাইড, জার, সাহায্যকারী বই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গলদা চিংড়ির রেণু শনাক্তকরণ

- শিরবক্ষের খোলসে লম্বালম্বি কয়েকটি রেখা থাকে।
- লার্ভার আকার বড় হলে উদর খন্ডকের সংযোগস্থলে নীল বর্ণের ডোরাকাটা দাগ দেখা যায় (চিত্র-৫০)।

চিত্র ৫০ ঃ গলদা চিংড়ির রেণু

বাগদা চিংড়ির রেণু শনাক্তকরণ

- দেহের পেটের দিকে আগাগোড়া টানা একটি লালচে বা বাদামী দাগ থাকে।
- উদরের নিম্নদেশে ১৪-১৯ টি লালচে বাদামী ফোটা ফোটা দাগ থাকে।
- জীবিত পোনা মাথা ৪৫% নিচের দিকে রেখেও লেজ উপরে রেখে সাতার কাটে (চিত্র-৫১)।

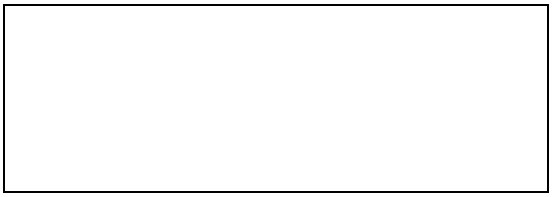

চিত্র ৫১ ঃ বাগদা চিংড়ির রেণু

কার্যপ্রণালী

জাল দ্বারা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে একটি জারে রাখতে হবে এবং ৫% ফরমালিন দ্বারা সংরক্ষণ করতে হবে। যদি গবেষণাগার সংগ্রহের স্থানের কাছে থাকে তা হলে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। যারা পোনা ধরে তাদেরকে দিয়েও সংগ্রহের কাজটি করানো যেতে পারে। অথবা পোনা বিক্রেতাদের কাছ থেকে পোনা ক্রয় করে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

পোনাগুলো গবেষণাগারে এনে আলাদা কর€ন এবং মেগনিফাইং গ-াসের ভিতর দিয়ে প্রতিটি পোনা পরীক্ষা করে তা দেখে গলদা ও বাগদা চিংড়ির পোনা শনাক্ত কর€ন এবং ব্যবহারিক খাতায় ছবি একে টিউটরকে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিন।

চূড়া˜ ম ল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্ন

1□ বাংলাদেশে কোন গণের বেশি প্রজাতি বিদ্যমান। গণগুলোর নাম লিখুন।

2□ লোনা পানি ও স্বাদু পানির গণগুলোর নাম আলাদা আলাদা ভাবে লিখুন।

3□ বাংলাদেশের চাষ যোগ্য প্রজাতিগুলোর নাম লিখুন।

4□ ১০টি চিংড়ির বাংলা নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

5□ ঘেরে চিংড়ি চাষের পদ্ধতি বর্ণনা কর€ন।

6□ ধান ক্ষেতের চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর€ন।

7□ সনাতন পদ্ধতিতে চাষ কীভাবে হয় তা লিখুন।

8□ আধা নিবিড় চাষ কীভাবে হয় তা উলে- খ কর€ন।

9□ নিবিড় চাষ কীভাবে হয় তা লিখুন।

10□ গলদা চিংড়ির চাষ প্রণালী বর্ণনা কর€ন।

11□ বাগদা চিংড়ির চাষ প্রণালী বর্ণনা কর€ন।

12□ চিংড়ির পুকুরের স্থান নির্বাচনে কোন কোন বিষয় দেখতে হবে তা লিখুন।

13□ চিংড়ি ধরার প্রতিক্রিয়াগুলো বর্ণনা কর€ন।

14□ জলাশয় শুকিয়ে চিংড়ি ধরলে কী কী উপকার হয় তা বর্ণনা কর€ন।

15□ কোন দিকগুলো লক্ষ্য রেখে চিংড়ি আহরণ করতে হবে তা লিখুন।

16□ আংশিক ও সম্ž র্ণ আহরণ পদ্ধতিগুলোর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর€ন।

উত্তরমালা

পাঠ ৫.১

১। ঘ	২। ঘ	৩। গ	৪। গ	৫। ঘ

পাঠ ৫.২

১। গ	২। খ	৩। গ	৪। গ	৫। ক

পাঠ ৫.৩

১। খ	২। খ	৩। ঘ	৪। খ	৫। ঘ

পাঠ ৫.৪

১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। খ